আলী তানতাভী

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৫

দুই সওদাগরের কাহিনী

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
অনূদিত

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-৫

আলী তানতাভী

দুই সওদাগরের কাহিনী
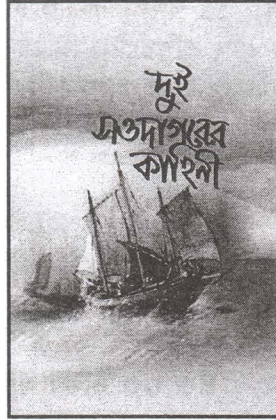
অনুবাদ
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-৫

লেখক : আলী তানতাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮ ঈ.

কিতাব কানন, দোকান নং- ৪০ (দোতালা), ১১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

মূল্য:
৪০.০০ টাকা মাত্র

Shishu Koshur Series: Golpe Anaka Etihash- { History in drawn Story} by Ali Tantawi, Translated by Yahya Yusuf Nadwi, Published by : Kitab Kanan, Islami Towar, 11 Bangla Bazar, Dhaka. Price : $ 3 only £ : 2 only

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৫

দুই সওদাগরের কাহিনী

দুই সওদাগরের কাহিনী

বাগদাদ ঃ পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র

এমন যদি হয়–
সারা পৃথিবী মিলে একটি দেশ হয়, তাহলে সে দেশের রাজধানী হবে কোন্ শহরটা? চোখ বন্ধ করেই বলা যায়– বাগদাদ!
হ্যাঁ, তখন বাগদাদই ছিলো পৃথিবীর সবচে' সুন্দর শহর। মনোলোভা ও দৃষ্টিকাড়া শহর। এক কথায় যেনো স্বপ্নপুরী। একবার কেউ বাগদাদে এলে তার আর বাগদাদ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হতো না। বাগদাদের চিত্তাকর্ষক ইমারত, তার শান-শওকত এবং সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তার চোখে-মুখে-অনুভূতিতে কেবলই মুগ্ধতা ছড়াতো।
বাগদাদ ছিলো সুন্দরের দেশ।
বাগদাদ ছিলো সবুজের দেশ।
বাগদাদ ছিলো তিলোত্তমার দেশ।
সেখানে বসতো জ্ঞানের আসর।
সেখানে বসতো কবিতার আসর।
সেখানে বসতো গুণীদের আসর।

জ্ঞানের আলোকমালায় আর গুণীদের মিলনমেলায় প্রতিদিনই

বাগদাদ হয়ে উঠতো জ্ঞানের নগরী। আলোর নগরী। স্বপ্নের নগরী। সেখানকার বিশাল বিশাল লাইব্রেরীতে ঢুকলে মনে হতো তা যেনো এক নিস্তরঙ্গ মহা সমুদ্র। কান পাতলেই শোনা যায় হাজার বছরের গর্ভে লুকিয়ে থাকা হাজার কথার নিঃশব্দ কল্লোল-ধ্বনি।

এতো হলো জ্ঞানী-গুণীদের বাগদাদ! কেমন ছিলো প্রকৃতির বাগদাদ? কেমন করে শোভা ছড়াতো 'বাগদাদের প্রকৃতি'? হ্যাঁ, সমস্ত নদী-নালার পানিও আছড়ে পড়তো– বাগদাদের দজলা-ফোরাতে এসে। এক কথায়– বাগদাদ ছিলো প্রতিভা-মনীষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধন-সম্পদ ও নয়নাভিরাম দৃশ্যের অপূর্ব লীলাভূমি। সেখানে যেমন বসতো জ্ঞান-বিতরণ মেলা, জ্ঞান-অধ্যয়ন মেলা, তেমনি বসতো সওদাগরদের বাণিজ্য মেলা।

সেখানে যেমন বসতো জ্ঞানী-গুণীদের আসর, তেমনি বসতো প্রকৃতি প্রেমীদের আসর । সুতরাং কোনো কবি যদি নিজের আবেগকে ধরে রাখতে না পারেন এবং বলে উঠেন– 'এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে বাগদাদ নগরী', তাহলে তাকে 'না' বলা বড়ো কঠিন!

* * *

আমরা এখন এই ইরাকে আজমের দুই সওদাগরের কাহিনী নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। পড়তে পড়তে তোমাদের মনে হবে– আমি বাস্তব কোনো কাহিনী পড়ছি নাকি এ কোনো কল্পকাহিনী? আসলে এ হলো বাস্তব। কিন্তু আগের যুগের সেই বাস্তব যে এই যুগের কল্পনাকেও হার মানায়! মানাবেই। কারণ সে যুগটা ছিলো আমাদের ইতিহাসের সোনালী যুগ। আর এ-যুগটা হলো 'নতুন জাহিলিয়াতের যুগ'। স্বার্থ ও মুনাফা-চিন্তাই এ-যুগের

সবচে' বড় চিন্তা। 'মানুষের তরে মানুষ আমরা'– এ-কথা বলার লোক এ-যুগে বড়ো কম। আমরা কি আবার ফিরে যেতে পারবো আগের সেই সোনালী যুগে?

সূচনা

বাগদাদ নগরীর একটি শহরের নাম 'কারখ'। সেখানে বাস করতেন এক সওদাগর। তিনি খোরাসানের আরেক সওদাগরের সাথে মিলে-মিশে ব্যবসা করতেন। খোরাসানী সওদাগরের পণ্য বাগদাদের বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়াই ছিলো তার কাজ।

এ উপলক্ষে প্রতি বছরই বাগদাদে আসতেন সেই খোরাসানী সওদাগর। সাথে নিয়ে আসতেন হরেক রকম খোরাসানী পণ্য। বাগদাদের সওদাগর খোরাসানী সওদাগরের সমস্ত পণ্যই বিক্রি করে দিতেন খুব আমানতদারীর সাথে, দক্ষতার সাথে। ফলে খোরাসানী বন্ধু প্রচুর লাভ নিয়ে ফিরে যেতেন আর যাওয়ার সময় বাগদাদের বন্ধুকেও দিয়ে যেতেন প্রচুর লভ্যাংশ। এভাবে দু' বন্ধুর জীবনই কেটে যাচ্ছিলো বেশ সুখে-শান্তিতে।

দুঃখ-দিনের গল্প

একবার কেনো যেনো সেই খোরাসানী বন্ধু এলেন না। এলেন না তো এলেন না, পরের বছরও এলেন না। বাগদাদের বন্ধু এতে পড়ে গেলেন বেশ বিপাকে। তোমাদেরকে আগেই বলেছি, বাগদাদের বন্ধুর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন– এই খোরাসানী বন্ধু।

অবশ্য তার ছোটো-খাটো একটা দোকান ছিলো। কিন্তু পুঁজির অভাবে তাও একদিন বন্ধ হয়ে গেলো। এতে বাগদাদের বন্ধু পড়ে গেলেন আরো মুশকিলে। এখন কীভাবে দিন চলবে তার?

খোরাসানী বন্ধুর সহযোগিতা ছিলো, তাও এখন বন্ধ।

ছোটো-খাটো একটা দোকান ছিলো, তাও এখন বন্ধ।

পরিবার নিয়ে তাই তিনি পড়ে গেলেন মহা অসুবিধায়। অনাহারে অর্ধাহারে কাটতে লাগলো তার দিন। ছোট ছোট শিশুরা যখন ক্ষুধায় রোদন করে, তখন তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারেন না। বেরিয়ে যান অন্যত্র। ঘুরে বেড়ান যত্রতত্র।

কী করে বন্ধ করবেন তিনি শিশুর মুখের কান্না?

কী করে নেভাবেন তিনি বেসামাল ক্ষুধার আগুন?

তার চোখে পানি এসে যায়! আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন– আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো! তোমার সাহায্য ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই!

অমন করে হঠাৎ তার পরিবারে নেমে আসবে দুর্দিনের কালো ছায়া এবং দারিদ্রের নিষ্ঠুর থাবা, এমনটি কিছুদিন আগেও তার কাছে ছিলো অকল্পনীয়। তবু ধৈর্য ধরলেন তিনি। ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। ধৈর্যের এ-পরীক্ষায় তাকে সফল হতে হবে।

সবরে মেওয়া ফলে!

না! এভাবে আর চলছে না। উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। খাদ্যের খোঁজে বের হতে হবে। কোনো দয়াবানের কাছে যেতে হবে। কিন্তু তার 'ধনী মন' কারো কাছে হাত পাততে রাজি হলো না।

একদিন তিনি পেরেশান হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? কার কাছে হাত পাতবেন? পথে নেমে সব তার এলোমেলো হয়ে গেলো। দিক্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলে এলেন দজলার তীরে। বসলেন একটা সবুজ গাছের নীচে। প্রচণ্ড গরমে গা পুড়ে যাচ্ছিলো। শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্যে দজলার শীতল পানিতে নাইতে নামলে কেমন হয়?

আস্তে আস্তে তিনি পানিতে নামলেন। আহা! কী শীতল পানি! বাগদাদের বন্ধু প্রাণভরে দজলার পানির স্পর্শ নিলেন। ক্লান্তি দূর করলেন। বেসামাল ক্ষুধাটাও এখন আর মোচড় দিচ্ছে না। হঠাৎ তার মাথায় এলো খারাপ চিন্তা। আত্মহত্যা করে দারিদ্র ও ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না!

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন– অমন কাপুরুষের মতো মরে গিয়ে আমি না হয় 'মুক্তি' পেলাম, কিন্তু ক্ষুধা-ক্লিষ্ট পরিবারের দশা তখন কী হবে? আমার অনুপস্থিতি যে তাদের জন্যে আরো বড় বিপদ ডেকে আনবে! তাছাড়া আল্লাহ তো মানুষকে বিপদে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। আমি ধৈর্য্য ধরেছিও। নিজেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে অর্পণ করেছি। তাহলে আমার মাথায় অমন অসুন্দর চিন্তা আসবে কেনো? আল্লাহ্! ক্ষমা করো আমায়!'

পানিতে দাঁড়িয়েই বাগদাদের বন্ধু ইস্তেগফার পড়লেন। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর মনে মনে কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে না। কেননা মানুষ তো আর নিজের জীবনের আসল মালিক নয়! জীবনের আসল মালিক হলেন আল্লাহ্। তিনি জীবন না দিলে কোথায় পেতো মানুষ জীবন? তাহলে আসল মালিকের হুকুম অমান্য করে কী করে মানুষ নিজে

নিজেই কেড়ে নিতে পারে এই জীবন? কোন্ অধিকার বলে? আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা করে যারা বিদায় নেয় এ-দুনিয়া থেকে, পরকালে তাদের শাস্তি হবে ভয়ংকর। বারবার তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া হবে, আবার জীবিত করা হবে আবার শাস্তি দেয়া হবে। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসায় বাগদাদের বন্ধু ভীষণ অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট খাঁটি দিলে তাওবা করলেন। তারপর দজলার পানিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলেন–

'কই! আমি তো কোনোদিন হারাম পথে একটি দিরহামও উপার্জন করি নি! তাহলে কেনো ঘটবে আমার অমন ভাগ্য-বিপর্যয়? কেনো হবে আমার এই করুণ দশা? নিশ্চয়ই এতে লুকিয়ে আছে কোনো রহস্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ হলো এক পরীক্ষা। ধৈর্য ধরলে অবশ্যই আল্লাহকে আমি সাথে পাবো। তিনি তো ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন! নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় পাস করবো। আল্লাহ খুলে দেবেন আমার রিজিকের দরোজা। তিনি তো রাজ্জাক! তিনিই তো সব প্রাণীকে রিজিক দান করেন! বিপদগ্রস্ত মানুষ যখন আল্লাহকে ডাকে, তাঁর সকাশে চোখের পানি ফেলে, তার ডাকে তো মহান 'রাজ্জাক' সাড়া না দিয়ে পারেন না! তার তো অভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা না!'

এ-বিশ্বাসদীপ্ত চিন্তায় বাগদাদের বন্ধু মনের মাঝে অনেক শক্তি অনুভব করলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি তার বিশ্বাস ও ভরসার সমুদ্রে যেনো তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। দ্রুত তিনি তীরে উঠে আসতে লাগলেন।
কিন্তু হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ কী যেনো পায়ে বাড়ি খেলো। সাথে সাথে পানির ভিতরে যেনো একটা ঝনাৎ-ঝনাৎ শব্দ হলো! কী হতে

পারে এ-শক্ত জিনিসটা? উঠিয়ে দেখা যায় না? বাধা কোথায়?

অদম্য কৌতূহল মেটাতে ছোট্ট একটা ডুব দিয়ে 'জিনিসটা' তুলে আনলেন বাগদাদের বন্ধু! কাদা-বালি একটু ধুইতেই দেখা গেলো, একটা চামড়ার থলে। বেশ ভারি। কী আছে এর ভিতরে? তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। থলের মুখটা খুলে ফেললেন। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ভিতরে হাত ঢুকালেন। তারপর বিস্ময়মাখা চোখে মুঠোয় করে বের করে আনলেন ভিতরের জিনিস! ওখানে ঐ বুক পানিতে দাঁড়িয়েই।

কী অদ্ভুত! কী বিস্ময়!

এ যে স্বর্ণের আশরাফি!!

থলেটা যে একেবারে টইটম্বুর!

এ যে তিমির আঁধারে হঠাৎ আলোর ঝলকানি!!

আঁধার রাতের পর্দা চিরে এভাবেই বুঝি আসে– ঊষা!

আলোকোজ্জ্বল দিবসের বার্তা নিয়ে!

দারিদ্রক্লিষ্ট বান্দা'র মুক্তির বার্তা নিয়ে!
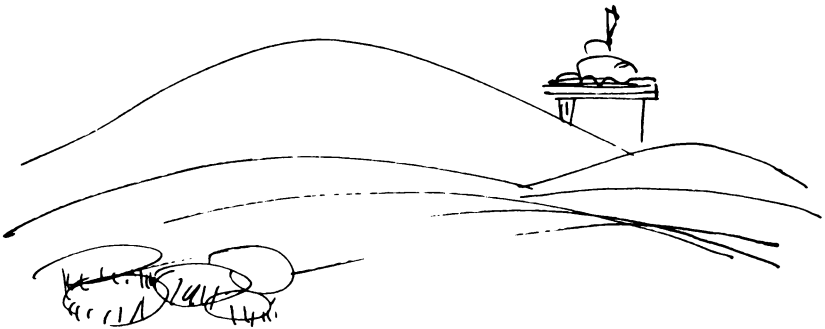
সবরে এভাবেই মেওয়া ফলে!

মালিক আমার! আমার আল্লাহ!

এই দুর্দিনে এতোগুলো স্বর্ণমুদ্রা যখন আমার হাতে পৌঁছে দিলে, এখন এর সামান্য অংশ আমার ক্ষুধা-জর্জরিত পরিবারের জন্যে খরচ করার অনুমতি দাও!

আল্লাহ আমার! রিজিকদাতা আমার!

তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি– যখনই কেটে যাবে আমার দুর্দিন, ঘুঁচে যাবে আমার অভাব, তখন এর মালিককে অবশ্যই আমি খুঁজে বের করবো এবং হারানো ধন তাকে বুঝিয়ে দেবো!'

বাগদাদের বন্ধুর হৃদয়ে বয়ে গেলো অপার্থিব আনন্দের হিমেল হাওয়া। মুখে রঙ ছড়ালো অনাবিল হাসির স্নিগ্ধ ছায়া। কৃতজ্ঞতায় বারবার নুয়ে আসছে আল্লাহ্‌র সামনে তার মাথা। গৃহে ছুটে এলেন তিনি– যেনো উড়তে উড়তে। অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের মলিন মুখে কতোদিন হাসি দেখেন না তিনি! আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে আসে!

এ অশ্রুর নাম– আনন্দাশ্রু!

আনন্দাশ্রুর দেখা মানুষ জীবনে কমই পায়!

* * *

গৃহে পা রাখলো বাগদাদের বন্ধু।

কোন্ গৃহে?

যে গৃহ ছিলো বিষাদে ভরা!

কোন্ গৃহে?

যে গৃহ ছিলো কান্নায় ঘেরা!

কোন্ গৃহে?
যে গৃহ ছিলো অন্নচিন্তায় দিশেহারা!
কোন্ গৃহে?
যে গৃহ এখনো জানে না–
সামনে কী আছে আনন্দমেলা!
কোন্ গৃহে?
যে গৃহ কোনোদিন দেখার সুযোগ পায় নি–
সবরে কীভাবে মেওয়া ফলে!
এখন বিষাদ বদলে যাবে– আনন্দে!
এখন কান্না বদলে যাবে– হাসিতে!
এখন ক্ষুধা বদলে যাবে– তৃপ্তিতে!
এখন দারিদ্র-মলিন দিনগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাবে–
ধৈর্যের পুরস্কারের সুখ-হাওয়া,
বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া পুষ্পরেণুর মতো!
বিপদে যারা ধৈর্য ধরে,
আল্লাহ্র উপর যারা ভরসা করে,
নিজের ভাগ্যের ডোর যারা নিজের হাতে না রেখে–
আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দেয়,
তারা কান্নার পর এভাবেই হাসে!
এভাবেই হেসেছে!
এভাবেই হাসতে থাকবে!
এ-হাসি থামে না,
কেউ থামাতে পারে না।
কারণ এ-হাসি আল্লাহ্র দান–
বান্দার সবরের প্রতিদান!

দিন ফিরে পাওয়ার সকাল-বিকাল

বাগদাদের বন্ধু সংরক্ষিত একটা জায়গায় স্বর্ণভরা থলেটা রেখে দিলেন। আর সেখান থেকে যৎ সামান্য 'ধার' নিয়ে প্রথমেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করলেন। কিছুদিন পর নতুন করে দোকানটাও খুলে বসলেন।

আল্লাহ্‌র কী শান! এবার প্রচুর পরিমাণে তার লাভ আসতে লাগলো। দেখতে দেখতেই তার ব্যবসা বেশ বড় হয়ে গেলো। পূর্বের চেয়ে আরো বেশী আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ফিরে এলো তার সোনাঝরা-রূপাঝরা দিনগুলো!

তারপর?

তারপর তিনি 'দজলার থলে' থেকে যতো দিরহাম নিয়ে ছিলেন, গোনে গোনে তা রেখে দিলেন। কিন্তু 'দজলার থলে' তো আর দজলার থলে নয়; নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এর মালিক। এবার সেই মালিককে খুঁজে পেতেই শুরু হলো তার নতুন অভিযান।

দেখা দাও হে আমার উপকারী বন্ধু!

কিন্তু কতো খুঁজলেন, কতো জায়গায় গেলেন, কতোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন; তবু মালিকের কোনো সন্ধান মিললো না। ফলে বাগদাদের বন্ধুর দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়ে চললো। তার সুদিনের স্বচ্ছ নীলাকাশটায় এ-কোণে ও-কোণে দুশ্চিন্তার টুকরো টুকরো মেঘ জমতে লাগলো। এ-মেঘ কি আরো বাড়বে না কমে যাবে? এক সময় নেই হয়ে যাবে কি? আল্লাহ-ই ভালো জানেন। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বাগদাদের বন্ধু মুনাজাত করেন—

'আল্লাহ! আমার আল্লাহ!

তুমি সহজ করে দাও!
মালিকের সন্ধান মিলিয়ে দাও!
জলভাগ থেকে তুমি যদি আমাকে আশরাফি দান করতে পারো, তাহলে স্থলভাগে কেনো এর মালিককে পাইয়ে দেবে না! তুমি তো সবই পারো, মালিক! আমার মালিক!!'

দুশ্চিন্তায় মন মেঘলা
সাঁঝে সাঁঝে আকাশও মেঘলা
ঐ মেঘ-আকাশে লুকিয়ে আছে কি চাঁদ?

সেদিন রাতে প্রচণ্ড শীত পড়েছিলো, হাঁড়-কাঁপানো শীত। বাগদাদের বন্ধু ভালো নেই। অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। সারা গায়ে ব্যথা। ঘুম আসছে না। স্বর্ণমুদ্রার মালিককে খুঁজে না পেয়ে তার দুশ্চিন্তার কোনো সীমা নেই। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তাকে? কার কাছে জানা যাবে তার সন্ধান? শুয়ে শুয়ে এ-সবই ভাবছিলেন তিনি। এভাবে অনেকটা সময় কাটার পর তার চোখে হালকা ঘুম এলো। কিন্তু এই হালকা ঘুমটাও ভেঙে গেলো– রাস্তা থেকে ভেসে আসা একটা আর্ত-করুণ আওয়াজে। ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি। জানালাটা খুলতেই একটা ঝড়ো হাওয়া তার গায়ে এসে ধাক্কা দিলো। অসুস্থ শরীরটা শীতে কাঁপতে লাগলো। রাস্তায় আওয়াজটা লক্ষ্য করে তাকাতেই বিজলী-ঝলকানিতে তার চোখ পড়লো– এক পথিকের উপর। আর্ত-করুণ আওয়াজের উৎসটা যে এই পথিক, তা বুঝতে তার কোনো কষ্ট হলো না। আওয়াজটা তার কানে বাড়ি খেয়ে হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করছে। বৃদ্ধ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর কী যেনো বলছে, অস্পষ্ট।

বাগদাদের বন্ধু তো ভালো করেই জানেন– বিপদ কী! বিপদে মানুষের অসহায়ত্ব কী! তাই ব্যথা জর্জরিত শরীরটা নিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথিকের উদ্দেশ্যে। যদি তার কোনো উপকার করা যায়!

কাছে এসে বাগদাদের বন্ধু বৃদ্ধকে বললেন–

'তুমি কাঁদছো কেনো? তোমার কী কষ্ট, আমাকে বলবে?'

বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বললো–

'আমি একটা পাত্রে সামান্য দুধ নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ হাত থেকে পাত্রটা পড়ে ভেঙে গেছে।'

এ-কথা শুনে বাগদাদের বন্ধু অবাক কণ্ঠে বললেন–

'একটু দুধ পড়ে গেছে তাই বুঝি অমন করে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে হবে?!'

এ-কথায় বৃদ্ধ পথিকের কান্না আরো বেড়ে গেলো। হাউমাউ করে সে বলে উঠলো–

'হায়! যদি তুমি জানতে, আমি মোটেই দু'পয়সার দুধের জন্যে কাঁদছি না! আমি কাঁদছি আমার বিপদগ্রস্ত প্রসূতি স্ত্রীর জন্যে! এ-দু'টি পয়সাই ছিলো আমার কাছে অতি কষ্টে জোগাড় করা শেষ সম্বল! এই শেষ সম্বল দিয়েই আমি কিনেছিলাম দুধটুকু– আমার অসহায় অসুস্থ স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়ার জন্যে! এখন তার মুখে কিছু তুলে দিতে না পারলে তাকে হয়তো বাঁচানোই যাবে না!'

কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ আরো বললো–

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমি একদিন স্বচ্ছল ছিলাম। আমার অনেক বড় ব্যবসা ছিলো। কিন্তু কিছুদিন আগে হজ্ব মৌসুমে দজলার পাড়ে একটা থলে হারানোর পর আমার ভাগ্য বিপর্যয়

ঘটে!'

বাগদাদের বন্ধু দম বন্ধ করে কথাটা শুনলেন! তার কৌতূহল বাড়তে লাগলো। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন–

'কী ছিলো তোমার থলেতে?'

'কিছু স্বর্ণমুদ্রা এবং এক খণ্ড জহরত। কিন্তু তা হারিয়ে যাওয়াতে আমি মোটেই ভেঙে পড়ি নি, শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই আমি এর বিনিময় ও প্রতিদান আশা করি। কিন্তু আফসোস, এই শীতের রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে হচ্ছে আমাকে দু'টি পয়সার জন্যে! আমার অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত স্ত্রীর মুখে সামান্য খাবারও আমি তুলে দিতে পারছি না।'

বৃদ্ধ আরো বললো–

'শোনো, ধন-দৌলতের মালিক হয়ে গেলে প্রতারিত হবে না! অহঙ্কারী হয়ে উঠবে না! আর কারো দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দেখে বিদ্রূপ করবে না! এই পৃথিবীতে ধনীও কখনো গরীব হয় আবার গরীবও কখনো ধনী হয়!'

এবার বাগদাদের বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন–

'আচ্ছা, তোমার হারিয়ে যাওয়া থলেটা দেখতে কেমন ছিলো– একটু বলবে?'
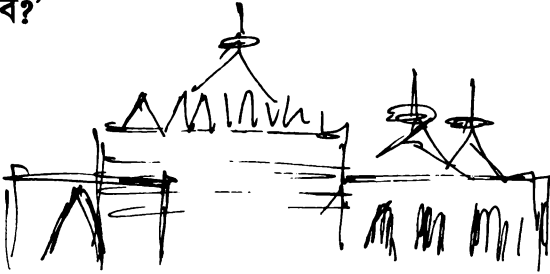
এ ভাবেই সূর্য উঠে, সকাল হয়!
এ ভাবেই আঁধার পালায়, পাখিরা গান গায়!

কিন্তু বৃদ্ধ পথিক বাগদাদের বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিলো না। কান্নাভেজা কণ্ঠে শুধু বললো–
'কেনো আমাকে বিরক্ত করছো?
কেনো ঠাট্টা করছো আমার সাথে?
তুমি কি বুঝতে পারছো না– আমার দারিদ্র?
আমার অসহায়ত্ব?
গভীর রাতে বৃষ্টিভেজা আকাশের নীচে–
আমার এই দাঁড়িয়ে থাকা?
শুনতে পাচ্ছো না– আমার আহাজারী?'

এই বলে বৃদ্ধ সামনে হাঁটতে শুরু করলো। তবুও কোনো সৃষ্টির কাছে হাত বাড়াতে তার বিবেকে বাধলো। মানুষের কাছে এখন আর কিছুই চাওয়ার নেই। সবাই তাকে হতাশ করেছে। ব্যথা দিয়েছে। দূরে ঠেলে দিয়েছে। অপমানিত করেছে। এখন সে অন্য ঠিকানা খুঁজছে। আকাশের ঠিকানা। আল্লাহ্‌র ঠিকানা। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁর কাছেই জানাবে সে নিজের অসহায়ত্বের কথা। নিজের কষ্টের কথা। নিজের অভাব-অনুযোগের কথা। তাঁর কাছেই এখন বিপদ-মুক্তির মুনাজাত করবে। তাঁর দরবারেই পেশ করবে অশ্রুভরা আকুতি। তাঁকেই এখন ডাকবে সে– 'হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!' বলে।

ব্যথিত হৃদয়ের তপ্তাশ্রুতে বুক ভাসিয়ে আল্লাহকে ডাকতে পারলে, আল্লাহ সাড়া না দিয়ে পারেন না! তাঁর নিকট ব্যথিত ও ভাঙা হৃদয়ের অনেক মূল্য! তাঁর স্মরণে ঝরানো তপ্তাশ্রুর মূল্য– তাঁর

নিকট সীমাহীন!
সেদিন তিনি কি সাড়া দেন নি দজলার তীরে–
বাগদাদের বন্ধুর সকাতর মুনাজাতে?
আজ কেনো তাহলে সাড়া দেবেন না–
এই বৃদ্ধ পথিকের করুণ কান্নার ডাকে?
এই বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে?
কেনো দেবেন না?
অবশ্যই দেবেন!

বিপদে ধৈর্য ধরলে কাউকেই তিনি বঞ্চিত করেন না। ব্যর্থ করেন না। নইলে বাগদাদের বন্ধু কেনো ব্যথা জর্জরিত দেহটা নিয়ে শীত-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তার পেছনে পেছনে হাঁটছেন? দৌড়াচ্ছেন? ব্যাকুল কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন–

'একটু দাঁড়াও না ভাই! বলো না, তোমার থলেটি কেমন ছিলো?'
কোন্ অদৃশ্য শক্তি তার অসুস্থতার গায়ে সুস্থতার প্রলেপ এঁকে দিলো?

ব্যথা-জর্জর দেহটায় নব্যতা ও সজীবতা এনে দিলো?
এ-সবই ধৈর্যের ফল ও ফুল।
তাওয়াক্কুলের দান ও ধন।

হ্যাঁ, এই যে বাগদাদের বন্ধু যন্ত্রচালিতের ন্যায় তার সাথে সাথে চলছেন বরং দৌড়চ্ছেন; তা কেনো? কিসের টানে? কারণ একটাই। ঐ যে অসহায় পথিক আল্লাহ্‌র কাছে অশ্রুর নজরানা পেশ করছে– তাকে তো এখন আর ফিরিয়ে দেয়া যায় না! সাহায্য করতে হবে! আল্লাহ তো আর নিজে এসে তাকে সাহায্য করবেন না, কাউকে ওসীলা বানিয়েই তাকে সাহায্য করবেন! হ্যাঁ, এই

ওসীলাই হলেন বাগদাদের বন্ধু! নইলে অসুস্থ শরীর নিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেনো তিনি গভীর রাতে এই বৃদ্ধের পেছনে পেছনে ছুটবেন?

আল্লাহ! তোমার কী শান!

এভাবেই তুমি মানুষকে সাহায্য করো!
সব সময়!
কিন্তু মানুষ বোঝে না!
মানুষ জানে না!
মানুষ বুঝতে চায় না!
মানুষ জানতে চায় না!
মানুষ বড়ো অকৃতজ্ঞ!

* * *

আবার তার থলেটি সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–
'ভাই বলো না, তোমার থলেটি দেখতে কেমন ছিলো?'

বৃদ্ধ এবার পথচলা বন্ধ করে দিলো। ফিরে তাকালো তার দিকে। তারপর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো– থলে হারানোর কাহিনী। খুব সংক্ষেপে। বাগদাদের বন্ধু কান পেতে সব শুনলেন। যা বোঝার বুঝে ফেললেন। তার মুখে ফুটে উঠলো ভুবন-ভোলানো শিশু-হাসি! সত্যিই অবিশ্বাস্য! এই গভীর রাতের নির্জন প্রহরে অমন 'বিছানায় শুয়ে' তিনি পেয়ে যাবেন থলের আসল মালিককে, তা কল্পনা করতেও তার কষ্ট হচ্ছে!
এ যে কল্পনার চেয়েও কল্পনাময়!
এ যে স্বপ্নের চেয়েও স্বপ্নময়!
নিমিষেই দূর হয়ে গেলো তার দেহের অসুখ!

মনের অসুখ!
সব অসুখ!
কিন্তু তিনি সবকিছুই চেপে গেলেন। রহস্যকে রহস্যই রাখলেন। আপাতত রহস্যের পর্দাটা টেনেই রাখলেন। আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে বৃদ্ধকে বললেন–
'তোমার স্ত্রী কোথায়?'
বৃদ্ধ উত্তর দিলো ভাবলেশহীনভাবে–
'একটা সরাইখানায়।'
'চলো! আমি তোমাকে একা ছাড়বো না, সঙ্গে যাবো! এখন থেকে আমি তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবো!'

দুঃখের মাঝেই অদৃশ্য থাকে সুখ!
মেঘের আড়ালেই ঢাকা থাকে সূর্যের মুখ!

বাগদাদের বন্ধু বৃদ্ধের স্ত্রীকে সোজা নিয়ে এলেন নিজের গৃহে। তারপর দ্রুত তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। প্রয়োজনীয় সেবার জন্যে একজন ধাত্রীকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বসলেন বৃদ্ধের মুখোমুখি। একটু নিরীক্ষণ করলেন তাকে। নিরীক্ষণে বের হয়ে এলো আরো বিস্ময়কর ফলাফল! এ-বৃদ্ধ তো শুধু থলের মালিক নয়– এ যে তার হারানো বন্ধুও বটে! হ্যাঁ, সেই খোরাসানী বন্ধু! আল্লাহ আবার তাদেরকে মিলিয়ে দিলেন– এই মেঘলা রাতে! সুবহানাল্লাহ!!

কিন্তু খোরাসানী বন্ধুটি এখনো তার প্রিয় বন্ধুকে চিনতে পারলেন না। তাই বাগদাদের বন্ধুর এ-মানবিক মধুর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় এবং সহযোগিতা ও সংস্থাপনে বারবার তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন।

কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

বাগদাদের বন্ধু কি সব জানিয়ে দেবেন এখন খোরাসানীকে?
বলবেন কি, তুমিই আমার হারানো বন্ধু!
আমিই খুঁজে পেয়েছি তোমার সেই থলে!
তা আছে এখন আমারই হেফাজতে!
না! এখন বলা যাবে না।
এখন রহস্য ফাঁস করা যাবে না।

কারণ, খোরাসানী বন্ধুর এখন যে অবস্থা, সব বললে আনন্দের আতিশয্যে হয়তো সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাই যাবে! তবে বাগদাদের বন্ধু প্রতিদিন তাকে কিছু কিছু করে 'হাত-খরচ' দিয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে রহস্য অজানা থাকায় খোরাসানী বন্ধু বাগদাদের বন্ধুর মহানুভবতা ও বদান্যতায় যেনো অকূলে কূল পেলেন। মাটির পৃথিবীতে বসেই যেনো তিনি আকাশের রূপালী চাঁদটাকে ছুঁয়ে ফেললেন!
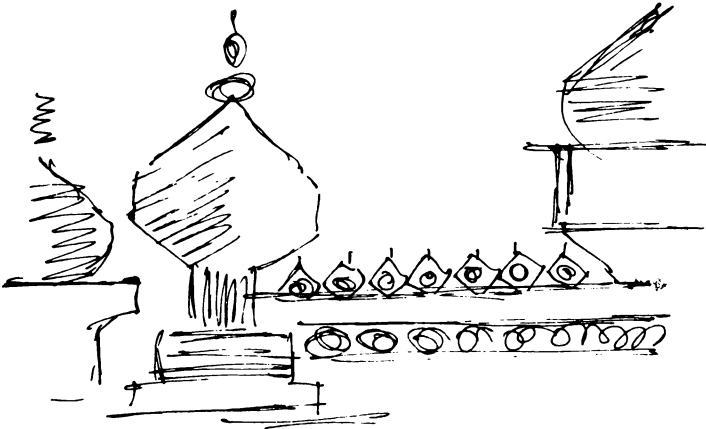
ধাপে ধাপে বিস্ময়!!

কিছুদিন পর সুযোগ মতো বাগদাদের বন্ধু খোরাসানী বন্ধুকে বললেন–

'এবার বলো তোমার কাহিনী– কীভাবে হলো তোমার এই অবস্থা?'

খোরাসানী তার কাহিনী বলা শুরু করলেন এভাবে–

'আমার দেশ খোরাসানে। আল্লাহ্ বেশ ধন-দৌলত দিয়েছিলেন আমাকে। প্রতিবছর আমি হজ্ব মওসুমে মক্কায় আসতাম। আমার এক বন্ধুর সহযোগিতায় বিভিন্ন পণ্য মক্কার বাজারে বেচা-কেনা করতাম। প্রচুর লাভ নিয়ে খোরাসান ফিরে যেতাম।

প্রতি বছরের মতো একবার আমি হজ্বের সফরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যেই শহরের শাসনকর্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে হাজির হলাম শাসনকর্তার মহলে। তিনি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর খাস কামরায় নিয়ে বসালেন। বললেন–

'তোমার আমানতদারীর কথা আমি অনেক শুনেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের জন্যে তোমাকে ডেকেছি। আমার কাছে জহরতের একটা টুকরো আছে। জানো তো, জহরত অনেক মূল্যবান পাথর। সচরাচর পাওয়াই যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে আমি এটা বিক্রি করবো। কিন্তু খোরাসান শহরে কে কিনবে এই পাথর? তাই আমি চাই– দায়িত্বটা তুমিই নাও এবং খলীফার প্রাসাদে কারো কাছে উপযুক্ত দামে বিক্রি করে দাও।'

আমার প্রতি শাসনকর্তার বিশ্বাস ও আস্থা দেখে আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং সানন্দে তার প্রস্তাবে রাজি হলাম।

শাসনকর্তা খোরাসান ত্যাগ করার সময় আমাকে বিদায় জানালেন

এবং সেই জহরত-খণ্ডটির সাথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন–

'সাবধানে যেয়ো!'

'নিশ্চিন্ত থাকুন আমীর! আমি বেঁচে থাকতে এর উপর কারো হাত পড়তে দেবো না!'

থলেটি শক্ত করে আমার কোমরে বাঁধা ছিলো। সফরের প্রতিটি মুহূর্তেই আমি ছিলাম সজাগ ও সতর্ক।

* * *

একদিন আমি বাগদাদ পৌঁছে গেলাম। কী ভেবে যেনো দজলার তীরে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। প্রচণ্ড গরমে শরীর থেকে তাপ বেরুচ্ছিলো। তাই থলেটা এক জায়গায় রেখে দজলার পানিতে নেমে পড়লাম। আমার দৃষ্টি ছিলো থলেটির উপর মুহূর্তে মুহূর্তে। শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে উঠে এলাম। ততোক্ষণে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চারদিক ছেয়ে গেছে আবছা অন্ধকারে। আমি তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। এদিকে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বোকার মতো থলেটির কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম তো ভুলেই গেলাম। মনে পড়লো তখন, যখন পেরিয়ে গেছে অনেক বেলা। এক রাত এক দিন। সাথে সাথে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বারবার ইন্না লিল্লাহ পড়তে লাগলাম। অনেক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর ছুটলাম দজলার দিকে।

দজলার তীরে এসে অনেক খোঁজলাম, কিন্তু আমার থলের কোনো চিহ্নই সেখানে দেখতে পেলাম না। দজলার তীর যেনো আস্তো থলেটাই গিলে ফেলেছে। পরিণতির কথা ভেবে বারবার শিউরে

উঠলাম। একটা পাথর খণ্ডে আমি অনেকক্ষণ নির্জীব হয়ে বসে রইলাম। তারপর রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় করে শহরের পথে পা ফেলতে লাগলাম।

ঘটনাটা বিরাট বড় একটা দুর্ঘটনা হলেও আমি হতাশ হলাম না, ভেঙে পড়লাম না। ভাবলাম, আল্লাহ আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা বিক্রি করে হলেও হীরক খণ্ডটির মূল্য পরিশোধ করে দেবো।
আমি খোরাসান ফিরে এলাম। শাসনকর্তাকে দশ হাজার দিনার দিয়ে থলে হারানোর বিষয়টা বললাম। কিন্তু শাসনকর্তা আমার কথায় সত্যের ধ্বনি শুনতে পেলেন না। সম্ভবত সে যোগ্যতাও তাঁর ছিলো না। তিনি অবিশ্বাসের সুরে বললেন–
'শুধু হীরের টুকরোটির মূল্যই তো কমপক্ষে চল্লিশ হাজার দিনার হবে! আর তুমি দিচ্ছো আমায় মোটে দশ হাজার! সত্বর বাকি দিনার হাজির করো!'

তখন বাধ্য হয়ে আমার যা কিছু ছিলো– বিক্রি করলাম, তবু শাসনকর্তার দাবী পূরণ করতে আমি ব্যর্থ হলাম।
শাসনকর্তা প্রতারণার অভিযোগ এনে আমাকে বন্দি করলেন। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জেলে পাঠালেন।

আহ! কী নিষ্ঠুর ছিলো জেলখানার দিনগুলো! একেকটা দিন যেনো একেকটা বছরের দীর্ঘতা নিয়ে হাজির হতো। দুঃখে-কষ্টে-রাগে-অভিমানে আমি অশ্রুপাত করতে লাগলাম। এভাবে জেলে বসে কাটাতে হলো একে একে সাতটি বছর। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমার সুখী স্বচ্ছল পরিবারে নেমে এলো ছিন্নমূল দশা। মহা বিপর্যয়।

কিছুদিন পর শহরের কিছু মহৎপ্রাণ মানুষের সুপারিশে আমি জেল

থেকে বের হতে পারলাম। তারপর থেকেই আমি দেশ ছাড়া। ছিন্নমূল। পরিবার নিয়ে নানা দেশে ঘুরে ফিরছি। কখনো এ কাফেলার সাথে। কখনো ও কাফেলার সাথে। ক্ষুধায় যখন বেসামাল হয়ে পড়েছি কিংবা প্রয়োজন যখন তীব্র হয়ে পড়েছে, তখন মানুষের কাছে হাতও পেতেছি।

ভাই আমার! ধন-দৌলতের ভিতরে, আরাম-আয়েশের মাঝে হাজারো সুখ-রজনী কাটিয়ে এখন আমি পথের ভিখারী!

এই শহরে এসেছি আমি কয়েকদিন আগে। এক রাতে আমার স্ত্রীর তীব্র প্রসব বেদনা শুরু হলো। বাধ্য হয়ে আমি আশ্রয় নিলাম ঐ সরাইখানাটায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আর প্রসব বেদনায় আমার স্ত্রী ছটফট করছিলো। ব্যথায় তার চেহারা বারবার নীল হয়ে আসছিলো। তখন আমি একদম হাত-শূন্য। মাত্র দু' পয়সার মালিক। এদিকে আমি ছাড়া আমার স্ত্রীর পাশে থাকার মতো আর কেউ ছিলো না। বুঝতে পারছিলাম না– কী করবো। তাকে আমি এই অবস্থায় রেখে যেতে একদম সাহস পাচ্ছিলাম না। ফিরে এসে যদি আর না পাই! তখন স্ত্রী আমার ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন–
'জলদি গিয়ে আমার জন্যে কিছু নিয়ে আসুন! আমি আর পারছি না!'

আল্লাহ ভরসা বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। ততোক্ষণে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর দেখলাম সবেমাত্র একটা দোকান বন্ধ হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দোকানীকে ধরলাম। পয়সা দু'টি তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম–

'ভাই! আমার কাছে এই আছে। বিনিময়ে দোকানটা খুলে আমার অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে সামান্য খাবার দিলে ভীষণ উপকার হয়!'

দোকানীর মনটা নরম হলো। বিনা বাক্য ব্যয়ে দোকানটা খুলে আমাকে সামান্য দুধ ও খাবার দিলো।

ভাই! এরপরের কাহিনী তো তোমার জানা! হঠাৎ পাত্রটা পড়ে গেলো। দুধ ও খাবার নীচে পড়ে গেলো। এ দুঃখেই আমি কাঁদছিলাম। কী নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর সামনে দাঁড়াবো? কী তুলে দেবো আমার মুমূর্ষ স্ত্রীর মুখে?'

এভাবেই 'আঁধার দূরে যায় পালিয়ে জাগে পাখির গান!'

হ্যাঁ, রজনী এখন শেষ হয়ে যাবে।
এখন ভোর হবে।
আঁধার কেটে যাবে।
দুঃখ মুছে যাবে আঁধারের সাথে।
বরং পালিয়ে যাবে।
ভোর-বিহানের পাখিরা এখন গান গেয়ে উঠবে।
শিশিরস্নাত কলিরা এখন চোখ মেলে তাকাবে।

সৌরভ ছড়াবে।
খোরাসানীর এই যে মলিন বিষণ্ন মুখটা–
এখন তাতে চাঁদের হাসি ফুটবে।
খোরাসানী এখন সত্যের উপর থেকেও মজলুম হওয়ার পুরস্কার গ্রহণ করবে।

তার হাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ-পুরস্কারটা তুলে দেবেন–
বাগদাদের বন্ধু!
এসো হে বাগদাদের বন্ধু!

খোলো তোমার রহস্যের দুয়ার!

***

খোরাসানীর কাছে সব শুনে বাগদাদের বন্ধু অর্ধ-ফোকলা মুখে হেসে বললেন—
'বন্ধু! কেটে গেছে তোমার দুঃখ-রজনী!
এই চেয়ে দেখো উদিত হচ্ছে তোমার সুখ-রজনী!
আমি তোমাকে এখন এক বিস্ময়কর সুসংবাদ দিচ্ছি!
কিন্তু বেশী আত্মহারা হবে না!
নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে!

কিন্তু তা বলার আগে তোমার স্মৃতিকে একবার পরীক্ষা করে নিই! তাকাও তো আমার দিকে! ভালো করে দেখো তো আমার মুখ! চেনা চেনা লাগছে না?'
'না তো!'

'না তো মানে? আমিই তোমার সেই বাগদাদের বন্ধু! সেই বন্ধু, বাগদাদের বাজারে যে তোমার পণ্য বিক্রি করে দিতো!'

এবার খোরাসানী আর বসে থাকতে পারলেন না। একটু নিরীক্ষণ করেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন! বাগদাদের বন্ধুকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলেন। 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তার অতীত স্মৃতিগুলো একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অনেকক্ষণ পর তিনি আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে আনন্দ-অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন—

'বন্ধু! এতো মহৎ তুমি! এতো ভালো তুমি! কী বলে কোন্ ভাষায় তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো?'
'আমাকে আর ধন্যবাদ জানাতে হবে না! ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা—

সে শুধু তোমার পাওনা!'
'মানে?'
'তোমার ওসীলাতেই তো আল্লাহ আমাকে আমার সুন্দর দিন ফিরিয়ে দিয়েছেন!'
'কীভাবে?'
'আমি তোমাকে প্রতিদিন এই যে কিছু কিছু করে দিরহাম দিয়ে যাচ্ছি– তা মোটেই আমার থলে থেকে নয়, তোমার থলে থেকে!'
'মানে?! আমার তো থলেই নেই!!'

মানে একেবারে সোজা! আমিই কুড়িয়ে পেয়েছি দজলার পানিতে তোমার সেই হারানো থলে!!'
এরপর সে খোরাসানীকে সব খুলে বললো!

এই দিনার সেই দিনার!
এই জহরত সেই জহরত!

এ-কথা শুনতেই খোরাসানীর সারা মুখে আনন্দ ঝিলমিল করে উঠলো। বললো–

'ভাই! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? তুমি কি সত্য বলছো? সত্যি তুমি কুড়িয়ে পেয়েছো থলেটা? আছে তোমার কাছে সেই থলেটা?'

'কিন্তু তুমি 'থলে থলে' করছো কেনো? আমি তো সেই থলের ভিতরে রাখা এক হাজার দিনার সাথে করে নিয়েই এসেছি!!'
'আগে বলো, থলেটি তোমার কাছে আছে কি না!'
'হ্যাঁ আছে!'

এ কথা শোনা মাত্রই 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে খোরাসানী আনন্দে

চিৎকার করে উঠলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সিজদা! মাথা উঠিয়ে বললেন–
'এক্ষুণি থলেটি নিয়ে এসো!'

বাগদাদের বন্ধু অবাক চোখে তাকাতে তাকাতে থলে আনতে ভিতরে দৌড় দিলেন। তার অবাক দৃষ্টি যেনো বলছিলো– 'এক হাজার দীনারের চেয়ে এই জীর্ণ পানি-পঁচা থলেটার জন্যে আমার বন্ধু এতোটা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেনো? আছে কি কোনো রহস্য?'
একটু পর তিনি থলে নিয়ে হাজির হলেন। খোরাসানী চোখে-মুখে অপার বিস্ময় নিয়ে থলেটি হাতে নিয়ে কী যেনো দেখলেন তারপর আনন্দঝরা কণ্ঠে এবং মধুঝরা সুরে বললেন–
'ছুরি লাগবে যে একটা!'
ছুরি হাজির করা হলো!

বাগদাদের বন্ধুকে বিস্ময় সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় ঠেলে দিয়ে খোরাসানী ছুরি নিয়ে এবার থলেটা কাটতে লাগলেন।
থলে কাটা শেষ!
ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সেই জহরতটি!!
খোরাসানীর মুখে জান্নাতের হাসি!
বাগদাদের বন্ধুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মিষ্টি হাসি!
এ-সব হাসি কি যথেষ্ট?

না! মানুষকে শুধু হাসি উপহার দিলে আজ কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হবে না! আবার লুটিয়ে পড়লেন তিনি সিজদায়– মানুষের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায়!!

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তিনি আবার জড়িয়ে ধরলেন বাগদাদের বন্ধুকে! তারপর বললেন–

'নাও বন্ধু! এই এক হাজার দিনার আমার নয়– তোমার! আমার পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া!!'

কিন্তু বাগদাদের বন্ধু কোনো বদলা নিতে পছন্দ করলেন না। সফরের আগে আবার তিনি সবগুলো দিনার তাকে ফেরত দিতে চাইলেন। কিন্তু খোরাসানী না নেয়ার জন্যে পণ করে বললেন–
'না! এখান থেকে একটি দিনারও আমি নেবো না! যদি দিতেই চাও, তবে সামান্য রাহাখরচ আর একটা তাজাদম ঘোড়া আমাকে দিতে পারো!!'

কিন্তু বাগদাদের বন্ধু তার কথায় 'হ্যাঁ' বলতে পারলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করে শেষ পর্যন্ত তাকে তিনশত দিনার দিতে সক্ষম হলেন!
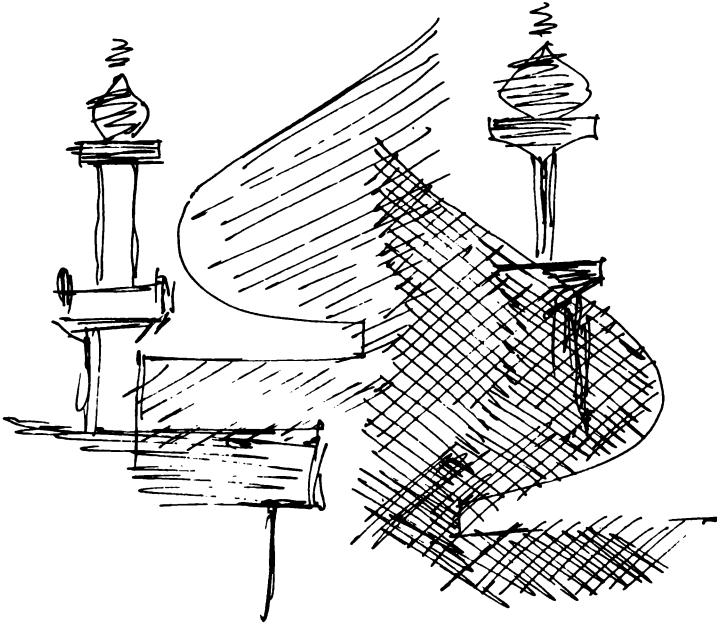
গল্পের শেষ কথা

পরের বছর খোরাসানী আবার এলেন বাগদাদে তার বন্ধুর কাছে। আগের মতো ব্যবসার পণ্য নিয়ে। দুই বন্ধুতে আবার শুরু হলো নতুন করে ঠিক আগের মতো সবকিছু। হারিয়ে যাওয়া জীবন আবার নতুন করে ধরা দিলো তাদের কাছে। শহরের শাসনকর্তাকে খোরাসানী ইতিমধ্যেই ফিরিয়ে দিয়েছেন– সেই জহরত। শহরের অনেক গণ্যমান্য মানুষ তখন হাজির ছিলেন তার সঙ্গে। শাসনকর্তা আগের অবিচার ও খারাপ আচরণের জন্যে বারবার ক্ষমা চাইলেন। খোরাসানীর সমস্ত সম্পদ তিনি ফিরিয়ে তো দিলেনই, সাথে দিলেন আরো অনেক অনে-ক উপহার।

বন্ধু!

এই গল্পের শেষ কী?

তা তোমাকে আর খুলে বলতে হবে কি?

চিরচেনা সেই উপসংহার!

ঠিক প্রাচীন গল্পের মতোই–

'তারপর সবাই মিলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত!'

* * *
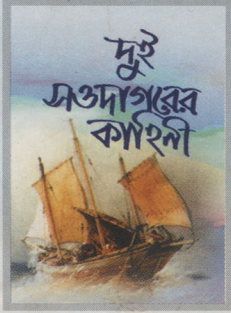
বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে- সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা- কে ভুলতে পারে?..

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তখনও সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে- সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়-গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ— ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

-আলী তানতাভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা